শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত

কালের কোলে

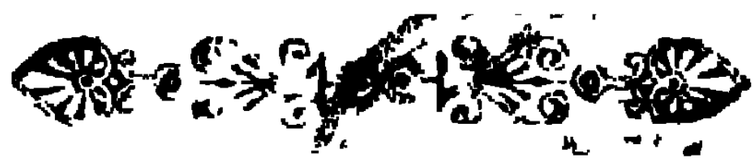

প্রকাশক—
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র
লক্ষ্মীবিলাস পাব্লিসিং হাউস
১২ নং নারিকেল বাগান, কলিকাতা।

মূল্য ১৲ টাকা।

প্রকাশক কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব
সংরক্ষিত।
২৫ শে পৌষ ১৩২৪।

শ্রীবলাইচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস হইতে মুদ্রিত।

কালের-কোলে

প্রথম পরিচ্ছেদ

আবাল্য এক সঙ্গে বর্দ্ধিত, একত্রে পালিত নরেন্দ্রনাথ যখন পঙ্কজিনীকে বিবাহ করিতে অসম্মত হইল, তখন যে শুধু তাহার পিতা দেবেন দত্ত বিস্ময়াপন্ন হইল তাহা নহে, অনেকেই মুখ চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিল। দেবেনবাবু বহুদিন হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, পঙ্কজিনীকে পুত্র নরেন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন; কিন্তু মানুষ যাহা ভাবে তাহাই যদি সকল সময় ঘটিত তাহা হইলে ভাবনার আর কিছুই থাকিত না, এই পৃথিবীই স্বর্গ হইত। এত অশান্তি, এত কোলাহল জগৎ জুড়িয়া অহঃনিশি উঠিত না,—এই সংসারটাই একটা শান্তি-কুঞ্জ হইয়া দাঁড়াইত।

যে দিন প্রথম পত্নী আসিয়া মুখখানা একেবারে কালি করিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "দেখ গা, নরু পঙ্কীকে বিয়ে কর্ত্তে চায় না।" সে দিন দেবেনবাবু কেবল যে পত্নীর মুখের দিকে কিছুক্ষণের জন্য একটা বিশ্রিভাবে চাহিয়াছিলেন তাহা নহে, কথাটা তাঁহার যেন একেবারেই

বিশ্বাস করিবার নয় বলিয়াই মনে হইয়াছিল। তিনি নিজেকে একটুখানি সামলাইয়া লইয়া বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?"

পত্নী কাত্যায়নী মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, "সে কাল মেয়ে বিয়ে কর্ত্তে চায় না। তার সমবয়সী সকলেরই সুন্দর বৌ হ'লো, আর তার যদি কালো বৌ হয় তবে লোকে বল্‌বে কি ? আর কারই বা বলো কাল মেয়ে বিয়ে কর্ত্তে ইচ্ছে হয় ? তা বাপু ছেলের যখন অপছন্দ তখন তুমি পঙ্কীর জন্যে অপর কোন ছেলে দেখ। একটা যেমন তেমন ভালো ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দিলেইতো হ'লো—তা হ'লেই তো তুমি দায় খালাস। নিজের ছেলের সঙ্গেই যে তার বিয়ে দিতে হবে এমন তো কোন লেখা পড়া নেই।"

এমন কোন লেখা পড়া নেই কথাটা যথার্থ বটে। পঙ্কজিনীর পিতামহ যখন অন্তিমশয্যায় দেবেনবাবুর হস্তে তাহার ক্ষুদ্র নাতনিটিকে অর্পণ করিয়া যান, তখন কেবলমাত্র একটী সুপাত্রের হস্তে পঙ্কজিনীকে সমর্পণ করিতেই অনুরোধ করিয়াছিলেন, এমন কথা তাঁহার মুখ হইতে একবারও বাহির হয় নাই যে, তাঁহার একমাত্র পুত্র নরেন্দ্রর সহিত তাহার আশ্রয়চ্যুতা এই পথের ভিখারিণী মেয়েটির বিবাহ দিতে হইবে। এটা কেবল দেবেনবাবুই মনে মনে স্থির করিয়া এতদিন পর্য্যন্ত পঙ্কজিনীর বিবাহ বিষয়ে একেবারে উদাসীন হইয়াছিলেন। তাঁহার এ কথাটা একবারও মনে পড়ে নাই যে,

দেবেন্দ্রনাথ সাবালক হইবার পর সনাতন দেশে চলিয়া গিয়াছিল; বহুদিন আর সে কলিকাতায় আসে নাই। কিন্তু দেবেনবাবু সনাতনের ঋণ ভুলিতে পারেন নাই। তাহাকে তিনি পিতার ন্যায়ই ভক্তি করিতেন। সে দেশে চলিয়া গেলে, তিনি তাহার সমস্ত ব্যয় মাসে মাসে মনিঅর্ডার যোগে নিয়মিত পাঠাইয়া দিতেন। এই অবস্থায় কয়েক বৎসর কাটিয়া যাইবার পর সহসা একদিন সনাতন তাহার ক্ষুদ্র নাত্‌নিটীর হস্ত ধরিয়া দেবেনবাবুর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। দামুদরের বন্যায় তাহার ঘর বাড়ী জোতজমা সকলি গিয়াছে, এমন কি তাহার পুত্র পুত্রবধূও সেই জলস্রোতের সহিত শেষ যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুর কোলে চির শান্তি লইয়াছে। কেবল বহুকষ্টে সে এই ক্ষুদ্র পৌত্রিটীকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে।

বহুদিন পরে আবার সনাতনকে দেখিয়া আনন্দে দেবেন-বাবুর প্রাণটা একেবারে ভরিয়া গেল, কিন্তু তাহার বিপদের কাহিনী শুনিয়া প্রাণে সত্যই গুরুতর আঘাৎ পাইলেন, তাঁহার নয়নে জল আসিল। সনাতনকে বাড়ীর কর্ত্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহার ক্ষুদ্র নাতনিটীকে তাঁহার একমাত্র পুত্রের সঙ্গিনী করিয়া দিলেন। তখন পঙ্কজিনীর বয়স সাত বৎসর আর নরেন্দ্রের বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর। তাহার পর ছয় বৎসর কালের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। এই ছয় বৎসরের মধ্যে কত পুরাতন কীর্ত্তি,—পুরাতন স্মৃতি ধরার অঙ্গ হইতে মুছিয়া গিয়াছে, আবার কত নূতন সামগ্রী নূতন আলোয়—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মায়ের আদরের পিতার এক মাত্র পুত্র নরেন্দ্রনাথের গুণ যতই থাক্, লোকটা বড় খাম খেয়ালি ছিল। খেয়ালের বসে এমনি সহসা এক একটা কাজ করিয়া বসিত যে, নির্ব্বোধ আখ্যাটা যেন তাহার কেনা হইয়া গিয়াছিল। কাজ এলোমেলো করিতে তাহার জুড়ি পাওয়া দুষ্কর। দশজনে মিলিয়া হয়তো একটা কাজ প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছে, ঠিক সেই সময় যদি কোন ক্রমে নরেন্দ্র আসিয়া তাহাতে যোগ দিল, অমনি সমস্ত কাজ একেবারে এলোমেলো হইয়া যাইত। পাঠশালা হইতে স্কুল, স্কুল হইতে এক্ষণে সে কলেজে পড়িতেছে, কিন্তু সে তাহার নির্ব্বোধ আখ্যাটা এ পর্য্যন্তও ঘুচাইতে পারে নাই। পঙ্কজিনী দিন রাত গুছাইয়াও নরেন্দ্রনাথের ঘরখানাকে আর কিছুতেই গুছাইয়া উঠিতে পারিত না। হয়তো পাঁচ মিনিটও হয় নাই পঙ্কজিনী প্রায় দুই ঘণ্টা কাল পরিশ্রম করিয়া তাহার গৃহটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া আসিয়াছে, আর অমনই নরেন্দ্রনাথ একবার মাত্র তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়াছে আর অমনি যেই কে সেই। এটা টানিয়া ওটা নাড়িয়া, বিছানা ধাম্‌সাইয়া পুস্তক ছড়াইয়া ঘরখানাকে এলোমেলো না করিয়া সে যেন সুস্থির হইতে পারিত না।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, আকাশ তারার মালা পরিয়া অন্ধকারের

কোলে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে। নরেন্দ্রনাথ তাহার পড়িবার ঘরের ভিতর একখানা সোফার উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিল। প্রায় এক ঘণ্টার উপর সে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে কিন্তু তখন পর্য্যন্ত গৃহের একটি জিনিষও স্থানচ্যুত হয় নাই। বর্ণ পরিচয়ের সুবোধ বালক গোপালের মত গৃহে প্রবেশ করিয়া একেবারে একখানি পুস্তক লইয়া বসিয়া ছিল। এতটা সুবোধ হইবার একটা কারণও ছিল, আজ কয়েকদিন হইতে তাহার বিবাহ লইয়া একটা মহা গোল উঠিয়াছে। নানা জনে নানা কথা কহিতেছে। তাহার এক আধ্‌টা যে তাহার কর্ণেও প্রবেশ করে নাই তাহাও নহে। এই সকল কারণে তাহার মেজাজটা আজ কয়েকদিন হইতে একেবারেই খিচ্‌ড়াইয়া গিয়াছিল। প্রাণটা অস্থির হওয়ায় সে একেবারে সুস্থির হইয়া পড়িয়াছিল; এমন কি এই কয়েকদিন হইতে সে কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা পর্য্যন্ত কহে নাই। এই সকল গোলমালে পড়িয়া তাহার এলোমেলো ভাবটা অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথ একমনে নিবিষ্টচিত্তে পুস্তক পাঠ করিতেছিল, সহসা চুড়ির শব্দে সে মস্তক তুলিয়া দ্বারের দিকে চাহিল। দেখিল হাসিতে হাসিতে পঙ্কজিনী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতেছে। এই মেয়েটাকে লইয়াই যত গোল বাধিয়াছে। পঙ্ককে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া আজ যেন নরেন্দ্রনাথের কেমন একটা রাগ হইল। মুখখানাকে একটু গম্ভীর করিয়া সে আপন মনে পুস্তক পাঠ করিতে লাগিল। পঙ্ক গৃহের ভিতর প্রবেশ

নিকট কেবল হাস্যস্পদ হইতে হয় নরেন্দ্রনাথের অবস্থাও কতকটা সেই ভাব হইয়া দাড়াইয়াছিল। সে চিরকাল নির্ব্বোধ হইয়া আসিয়াছে ও চিরদিন নির্ব্বোধ হইবে সে বিষয়ে পঙ্কজিনী একেবারে স্থির নিশ্চিত ছিল; তাই সে তাহাকে একটু চালাক করিবার জন্য নানাভাবে উদ্‌ব্যস্ত করিত, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ উন্নতির দিকে এক ইঞ্চিও অগ্রসর হইতে পারে নাই।

নরেন্দ্রনাথ নীরব হইবামাত্র পঙ্কজিনী বলিল, "বুঝেছি ঢের হয়েছে। আপনার মত বুদ্ধিমান লোক জগতে আর একটীও নেই। আজ থেকে আপনার খেতাব হ'লো বুদ্ধিরাজ।"

নরেন্দ্রনাথ পঙ্কজিনীর কথার মাঝখানেই বলিতে যাইতেছিল, "তা—"

পঙ্কোজিনী তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "তা র তায়ে কাজ নেই, এখন জ্যাঠামশাই ডাকছেন যাওয়া হবে কি?"

"নিশ্চয়" নরেন্দ্রনাথ সোফা ছাড়িয়া উঠিয়া দাড়াইল। সে গৃহ হইতে বাহির হইতেছিল কিন্তু আবার ফিরিয়া দাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা এখন বাবা আমায় হঠাৎ ডাকলেন কেন?"

পঙ্কজিনী বলিল, "তা আমি কেমন করে বলবো বল? আমিতো আর গুণতে জানিনে?"

নরেন্দ্রনাথ আবার ধীরে ধীরে সোফার উপর বসিয়া পড়িল। বেশ একটু ভারিক্কের মত মাথাটা নাড়িতে লাগিল। পঙ্কজিনীর কথার কোন উত্তর দিল না। তাহার ভাব দেখিয়া পঙ্কজিনী আবার হাসিতে হাসিতে বলিল, "এখন যাবে, কি যাবেনা, যা

পঙ্কজিনী বঙ্কিমভাবে নরেন্দ্রের প্রতি একটা তীব্র কটাক্ষ করিয়া বলিল, "কার কথার মানে হয় না, তা জ্যাঠাইমা বেশ জানেন। নইলে আর বল শুধু শুধু অসুখ হবে কেন। অসুখ বুঝি আবার কারুর নাকি বলে কয়ে হয়? অসুখ যখন হয় তখন শুধু শুধুই হয়।"

কাত্যায়নী পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমারও বাপু কোন বুদ্ধি শুদ্ধি নেই,—সেই জন্যই তো আমার এত ভাবনা। এত বড় ছেলে হ'লে এখন নিজের অসুখটা পর্য্যন্ত বোঝবার ক্ষমতা হ'লো না। এখন চল যাই দেখিগে আবার উনি তোমায় খুঁজছিলেন কেন?"

"না আমার বুদ্ধি নেই বই কি!" নরেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল।

কাত্যায়নী আর কথা কহিলেন না,—তিনি পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার স্বামীর গৃহের দিকে চলিয়া গেলেন। নরেন্দ্র ও কাত্যায়নী গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলে, পঙ্কজিনী ধীরে ধীরে যাইয়া সোফার উপর বসিল,—তাহার পর নরেন্দ্রের সেই পরিত্যক্ত পুস্তকখানা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্র পঙ্কজিনীকে বিবাহ করিতে চাহে না, এই কথাটা যে দিন হইতে দেবেন দত্তের কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, সেই দিন হইতেই তাঁহার প্রাণের শান্তি একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। দেবেন দত্তের স্বভাবটা ছিল শান্তি প্রিয়; তিনি চিরকালই কোন একটা ভাবনা চিন্তার মধ্যে নিজেকে জড়াইয়া ফেলিতে একেবারেই অনভ্যস্ত ছিলেন। ভাবনা চিন্তার তাঁহার বড় একটা বিশেষ কারণও ছিল না। মানুষের যাহা যাহা প্রয়োজন,—যাহার জন্য মানুষের ভাবনা চিন্তা, তাহার কোনটারই তাঁহার অভাব ছিল না। মনের মতন পত্নী,—সরল শান্ত পুত্র,—বিষয় সম্পত্তি জমিদারী;—তাঁহার অভাব কি! তিনি চিন্তা করিবেন কেন? কিন্তু আজ কয়দিন হইতে তাঁহার হৃদয়ে যে চিন্তার তুমুল তুফান উঠিয়াছে, তাহার যেন কূল কিনারা নাই। তিনি যেন একেবারে চিন্তা সাগরে ওতপ্রোত খাইতেছিলেন। তিনি নানা ভাবে সাঁতরাইয়াও কিছুতেই আর কিনারায় উঠিতে পারিতেছিলেন না। কেমন করিয়া তিনি একটী সুপাত্রের হস্তে পঙ্কজিনীকে সমার্পণ করিবেন,—কেমন করিয়া তিনি তাঁহার শেষ কর্ত্তব্য হইতে উদ্ধার পাইবেন! পঙ্কজিনীর রং একটু কালো;—আজকালকার দিনে একেই সুপাত্র পাওয়া কঠিন,—তাহার উপর কন্যার রং যদি ময়লা হয় তাহা হইলেতো একেবারে

পিতার কথার কোনই উত্তর দিল না,—কাত্যায়নী তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আমি কি তোমায় মিছে কথা বলেছি,—নরুইতো সেদিন আমায় বল্লে, না মা আমি পঙ্কীকে বিয়ে করবো না,—ওযে কালো! সত্যি মিথ্যে ওর মুখেই শোন না।"

দেবেনবাবু পুত্রের মুখ হইতে একটা কিছু শুনিবার জন্য কিছুক্ষণ নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু পুত্রকে নীরব দেখিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "তা হ'লে কথাটা যথার্থ! কিন্তু আমার মতে তোমার পঙ্ককেই বিয়ে করা উচিত ছিল। তার রং একটু কালো বটে কিন্তু অমন লক্ষ্মী মেয়ে হাজারে একটী পাওয়াও কঠিন। মাকে আমার ভগবান কহিনুর দিয়ে তৈরী করেছেন। মায়ের যে আমার কত গুণ তা কেবল আমিই জানি।"

দেবেনবাবুর কণ্ঠস্বর ক্রমেই গাঢ় হইয়া আসিতেছিল,—একটা নিবিড় স্নেহের উচ্ছাসে তাহার সমস্ত প্রাণটা একেবারে ভরিয়া উঠিয়াছিল,—তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না। মাতৃহারা, আশ্রয়চ্যুতা তাঁহার বড় আদরের সেই ক্ষুদ্র মেয়েটীকে তিনি কেমন করিয়া পরের ঘরে পাঠাইয়া দিবেন সেই কথাটা সহসা তাঁহার মনে হওয়ায়, নয়ন-পল্লব সিক্ত হইবার উপক্রম করিল, তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। কাত্যায়নী স্বামীর মুখের পানে চাহিয়াছিলেন; তিনি স্বামীর গাঢ় স্বরে প্রাণে বেদনা পাইলেন,—অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, "তা হক্‌গে কাল,—উনি যখন বল্‌ছেন, নরু তুই পঙ্কীকেই না হয় বিয়ে কর।"

পত্নীর কথায় বাধা দিয়া দেবেনবাবু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "না,—সে কথা আমি নরেনকে বল্‌তে চাইনে। যাকে জীবনের সঙ্গিনী কর্ত্তে হবে,—যাকে সঙ্গে নিয়ে চিরদিন সংসার কর্ত্তে হবে,—যে জীবনের সুখ দুঃখের সমভাগিনী হবে তাকে যদি গোড়ায়ই অপছন্দ হয় তা হ'লে জীবনে কোনদিনই সুখ হতে পাবে না। আমি এ বিষয় কখন কারুকে জোর কর্ত্তে পারিনে। এতে আমার মতামত যেটুকু, কেবল সেইটুকুই আমি বল্‌তে পারি।"

নরেন্দ্রনাথ চুপ করিয়া রহিল,—উচিত অনুচিত বিবেচনা করিবার ক্ষমতা তাহার কোন দিনই ছিল না। তাহার বন্ধুবর্গের সকলেরই গৌরবর্ণ পত্নী হইয়াছে, তাহার কেন হইবে না? পঙ্কজিনী যে তাহার কতখানি আপনার,—সে যে তাহার প্রাণের কতখানি স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে তাহা ধারণা করিবারও তাহার ক্ষমতা ছিল না। সে কালো মেয়ে বিবাহ করিতে চায় না, কিন্তু কেন যে চায় না, তাহাও সে বলিতে পারে না। পিতার কথায় তাহার প্রাণে যেন কেমন একটা নূতন তরঙ্গ জাগিয়া উঠিতেছিল,—সে তরঙ্গে তাহার সমস্ত প্রাণটা একেবারে দুলিতে লাগিল। দেবেনবাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া আবার অতি শান্ত কোমল স্বরে বলিলেন, "নরেন, আমি তোমায় পঙ্ককে বিয়ে কর্ত্তে অনুরোধ কর্‌ছিনে, তবে আমার বিশ্বাস তুমি তাকে বিয়ে কল্লে ভাল কাজই কর্ত্তে,—যাক্ আমি তোমাকে তিন দিন সময় দিলুম, বেশ ভালো করে একটু বিবেচনা করে দেখ। তারপর কি ঠিক কল্লে তোমার মাকে বলো।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঙ্কজিনীর বিবাহ স্থির হইয়া গেল। যাহা হইবার তাহা হইবেই। নিয়তি রাণীর অকাট্য বিধান অখণ্ডনীয়। তাহার অন্যথা করে কাহার সাধ্য। মানুষতো ক্ষুদ্র স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও তাঁহারই বিধানে ব্যাধের শরে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ যখন পঙ্কজিনীকে কিছুতেই বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইল না, তখন বাধ্য হইয়া দেবেনবাবু পঙ্কজিনীর জন্য একটী সুপাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অর্থের আনুকুল্য থাকিলে কিছুরই অভাব হয় না। রাশিকৃত অর্থের বিনিময়ে শীঘ্রই এক সুপাত্র দেবেনবাবু পঙ্কজিনীর জন্য স্থির করিলেন। পাত্র মিশিরপুরের জমীদারের একমাত্র পুত্র,—এইবার বি, এ, পরীক্ষা দিয়াছে। পাত্রের রূপও যেমন, চরিত্রও তেমনি। যথা সময়ে পঙ্কজিনীর পাকা দেখাও সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের দিনও নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। রজনীর অন্ধকার চাঁদের আলোয় লুকোচুরি খেলিতেছিল। আকাশে তারা নাই,—নীল আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ চন্দ্রমণ্ডল করিয়া ধরার গায়ে জ্যোৎস্না বৃষ্টি করিতেছিল। ফাল্গুনের মাতাল হাওয়া ফুলের গন্ধ হরণ করিয়া মাতালের মত ছুটিয়া আসিয়া গৃহের ভিতর, উন্মুক্ত ছাদে ঢলিয়া পড়িতেছিল। দেবেনবাবু তাহার শয়ন কক্ষে একাকী বসিয়া পঙ্কজিনীর বিবাহে

তো আমি কোন দিনও তোমাদের বাধা দিইনি। নরেন পঙ্কজকে বিয়ে কর্ত্তে চায়নি আমি তার অন্য পাত্র স্থির করেছি। এখন নরেন যাকে বিয়ে কর্ত্তে চায় তার সঙ্গে নরেনের বিয়ে দাও,—যত ইচ্ছে সাধ আহ্লাদ কর, আমার কোন আপত্তি নেই।"

কাত্যায়নীর স্বভাব ছিল কোমল,—পূর্ব্বেই বলিয়াছি মাতৃ-স্নেহ ব্যতীত তাঁহার হৃদয়ে আর কিছুই স্থান পায় নাই। নরেনের ভাল বৌ হইবে, নরেন সুখে থাকিবে, জীবনে তাঁহার তাহাই একমাত্র চিন্তা ছিল। সেই স্থানটায় কোনরূপে একটু আঘাৎ লাগিলেই তাঁহার সমস্ত প্রাণটা একেবারে যাতনায় অস্থির হইয়া উঠিত। তিনি একেবারে কোমর বাঁধিয়া স্বামীর সহিত তর্ক জুড়িয়া দিতেন; কিন্তু স্বামীর মুখের দুই তিনটা কথাতেই তাঁহার সমস্তই ঘুলাইয়া যাইত। স্বামী যাহা বলেন তাহাই ন্যায়, স্বামী যাহা করেন, তাহা কখনই অন্যায় নহে; এ বিশ্বাস কাত্যায়নীর সাবাল্য অটুট ছিল—এখনও আছে। কাজেই স্বামীর কথায় তাহার সমস্ত প্রাণটা যেন গলিয়া গেল। তিনি মুখখানি ভার করিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এওতো তোমারই অন্যায়। ছেলে যদি সত্যিই কিছু ভুল করে, তা সুধরে দেওয়া তোমারই তো উচিত। পঙ্কর সঙ্গে নরুর বিয়ে দেওয়াই যদি তুমি ভালো বিবেচনা করেছিলে, তাই কেন দিলে না। তুমি যদি জোর কর্ত্তে তা হ'লে নরুর সাধ্যি কি যে অমত করে।"

দেবেনবাবু মৃদু হাসিলেন; বলিলেন, "জোর ক'রে কখনও কোন কাজ পৃথিবীতে হ'তে পারে না। ভগবানের যা ইচ্ছে তা

চিরদিনই সম্পন্ন হয়ে আসছে,—চিরদিনই সম্পন্ন হবে। তবে আমার মতে যেটা ভাল, আমি সেটা বল্লুম, করা না করা সে তার ইচ্ছে। যে ভুল কর্‌বে তাকেই অনুতাপ কর্ত্তে হবে। এই ভগবানের রাজ্যের নিয়ম।”

স্বামীর সব কথার অর্থ কাত্যায়নী না বুঝিলেও এইটুকু বুঝিলেন যে, নিশ্চয়ই কোথাও একটা বড় রকমের অন্যায় হইতেছে, যাহা এখন আর সংশোধন করিবার উপায় নাই। তাহার প্রাণে ব্যথা লাগিল। তিনি স্বামীকে আর কোন প্রশ্ন করিতে পারিলেন না। তাঁহার নয়ন পল্লব অশ্রু সিক্ত হইয়া আসিল। দেবেন বাবু তাহা লক্ষ্য করিলেন, মৃদু স্বরে বলিলেন, এতে দুঃখ করবার তোমার কিছু নেই, জেনো সবই ভগবানের হাত। যাক্ নরেনের বিয়ের জন্যে তুমি ভেব না, পঙ্কর বিয়ের পরই আমি তোমার মনের মত একটী রাঙ্গা টুক্‌টুকে বউ দেখে নরেনের বিয়ে দিয়ে দোব।”

স্বামীর শেষ কথাটায় কাত্যায়নীর আবার যেন ধড়ে প্রাণ আসিল। সহসা প্রাণে আঘাত লাগায় তিনি অনেক কথাই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। প্রাণটা ঠাণ্ডা হইবামাত্রই তাহার প্রথমেই মনে পড়িল এখনও দুগ্ধ জাল দিবার বাকী রহিয়াছে। তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, বলিলেন, “তুমি যা ভাল বিবেচনা কর্ব্বে তাই হবে।”

কাত্যায়নী গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। দেবেনবাবু উঠিয়া বসিলেন। উন্মুক্ত গবাক্ষে তাহার দৃষ্টি পড়িল। গবাক্ষের

পঙ্কজিনী কোন কথা কহিতে পারিল না। দেবেনবাবুর কথাগুলা তাহার মরমে প্রবেশ করিয়া, হৃদয়ের ভিতর যেন একটা ভক্তি সমুদ্র সৃষ্টি করিতেছিল। দেবেনবাবু আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পঙ্কজনীর মুখের দিকে ফিরিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা এ বিয়েতে তোমার মত আছে তো ?"

পঙ্কজনী এতক্ষণে কথা কহিল, দেবেনবাবু যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, সে তাহার কোন উত্তর দিল না। অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "জ্যাঠামশাই আপনাকে ছেড়ে আমি কেমন ক'রে থাক্‌বো। আপনার জন্যে আমার বড় মন কেমন কর্‌বে।"

দেবেনবাবুর নয়নপল্লব ছল ছল করিয়া উঠিল,—তিনি অতি গাঢ় স্বরে বলিলেন, "কিন্তু আরতো তোমায় রাখতে পারিনি মা। প্রজাপতির পাখা নড়েছে, এখন তোমাকে তোমার স্বামীর ঘরে প্রতিষ্ঠা করাই আমার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। স্বামীই স্ত্রীলোকের পৃথিবীতে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা। তোমার দেব পূজার সময় উপস্থিত,—তার জন্যে তুমি মা প্রস্তুত হও।"

পঙ্কজিনী নীরব! সে আবেগ পরিপূর্ণ হৃদয় লইয়া চুপ করিয়া দেবেনবাবুর সম্মুখে দাড়াইয়া রহিল। তাহার অন্তরের ভিতর যে তরঙ্গ বহিতেছিল, সে ভাবিয়াছিল অবিচলিত ধৈর্য্যের দ্বারা সে তাহা প্রাণের ভিতরেই চাপিয়া রাখিবে,—কিন্তু আর বুঝি তাহা ঠেকাইয়া রাখা যায় না! সে প্রাণটাকে দৃঢ় করিবার জন্য তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিল। দেবেনবাবুও স্তব্ধ হইয়া নিজের অন্তঃকরণের মধ্যে নিজেকে গভীরভাবে নিহিত

সে সেই যে আসিয়া একখানি চেয়ার লইয়া গবাক্ষের সম্মুখে বসিয়াছিল, এখনও ঠিক সেইভাবেই বসিয়া আছে। রজনীর পর ঊষা আসিয়াছিল সেও এক্ষণে সূর্য্যের আলোকে ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, নরেন্দ্রনাথের তাহাও খেয়াল নাই। সে গবাক্ষের উপর পা দুইটা তুলিয়া দিয়া স্তব্ধ হইয়া আকাশের পানে চাহিয়া ছিল।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত নরেন্দ্রের কেহ খোঁজ করে নাই, কিন্তু এইবার নরেন্দ্রের খোঁজ পড়িল। কন্যা বিদায়ের সময় উপস্থিত হইয়াছে,—সকলেই কন্যা ও নব জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছিলেন। দেবেনবাবু কন্যা ও জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়া সর্ব্ব প্রথম নরেনের খোঁজ করিলেন। গৃহে সমস্ত আত্মীয় স্বজন উপস্থিত কেবল নরেন নাই। দেবেনবাবু নরেনকে দেখিতে না পাইয়া পত্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"সকলকে দেখতে পাচ্ছি নরেনকে দেখতে পাচ্ছিনে কেন? নরেন গেল কোথায়,—ডাক তাকে,—সে পঙ্কজকে আশীর্ব্বাদ কর্ব্বে না?"

কাল সমস্ত দিন রাত্রির ভিতর পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। স্বামীর কথায় কাত্যায়নীর পুত্রের জন্য প্রাণটাই চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "তাওতো বটে। ক'নে জামাই আশীর্ব্বাদ হচ্ছে; নরু বোধ হয় খবর পাইনি, যাই আমি তাকে ডেকে আনিগে।"

কাত্যায়নী পুত্রের অনুসন্ধানে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। এ ঘর সে ঘর ঘুরিয়া তিনি নরেন্দ্রনাথের শয়নগৃহে আসিয়া

এ কথা কণ্ঠ হইতে বাহির করিতে হইলে তাহার শেষ নিশ্বাস সেই মুহূর্ত্তেই চিরদিনের মত অনন্তের সহিত মিশিয়া যাইবে! নরেন্দ্রনাথ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাড়াইল বটে, কিন্তু পা দুইটা এক পদও অগ্রসর হইতে চাহিল না। পুত্রকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কাত্যায়নী আবার বলিলেন, "আবার দাড়ালি কেন? চ', তোর আজ হ'লো কি?"

হ'লো কি! এ কথা মুখ ফুটিয়া বলিবারও উপায় নাই। পঙ্কজিনী নারায়ণ শীলার সম্মুখে অপরের গলায় মালা অর্পণ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সে চিরদিনের মত পরের হইয়া গিয়াছে। আর তাহাকে আপনার বলিবার অধিকারটুকু পর্য্যন্ত নরেন্দ্রনাথের নাই। সে কথা মনে করিলে পর্য্যন্ত পাপ স্পর্শে—পঙ্কজিনীর নারীত্বে আঘাত লাগে। এখন যতই কষ্ট হউক, মৃত্যু দিন পর্য্যন্ত তাহা প্রাণের ভিতর চাপিয়া রাখিতে হইবে। দ্বিতীয় উপায় নাই। জননীর স্বরে নরেন্দ্রনাথ প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংযত করিয়া, জননীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

* * * * *

গৃহখানি আত্মীয় স্বজনে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে,—সেখানে আর তিল ধরিবার স্থান নাই। এই গৃহখানিই দেবেনবাবুর বাটীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাণ্ড ঘর। মূল্যবান আসবাব পত্রে গৃহখানি সজ্জিত। প্রাচীর গাত্রে বড় বড় আয়না,—আয়নার উপরে বৈদ্যুতিক আলোর দুই ডাল তিন ডালওয়ালা বেলওয়ারী

তাহার সেই অশ্রুভাবাক্রান্ত নয়নদ্বয় চকিতের ন্যায় একবার তুলিল। নরেন্দ্রনাথ সে চাহনি অনুভব করিলেন। সে চাহনির ভিতর যেন একটা তীব্র অভিমান শেল লুক্কায়িত ছিল। শক্তি শেলের মত সেটা একেবারে নরেন্দ্রের হৃদয়ের মাঝখানে সজোরে আসিয়া আঘাৎ করিল। নরেনন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সেই বেকাবী হইতে দুর্ব্বা ও ধান তুলিয়া লইয়া বর-ক'নের মস্তক স্পর্শ করিল। পঙ্কজিনী নরেন্দ্রের পদদ্বয়ের সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়া তাহার পদধূলী গ্রহণ করিল। সে মস্তক নত করিবামাত্র এক ফোটা অশ্রু নরেনের ঠিক পায়ের উপর টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল। সেই অশ্রুবিন্দু পদস্পর্শ করিবামাত্র নরেন্দ্রের মনে হইল যেন সেই স্থানটা পুড়িয়া একেবারে ছাই হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহের প্রতি শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিল। সে যে বর-ক'নেকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছে, সে কথা সে একেবারে বিস্মৃত হইল। মহা অপরাধীর মত তাহার সমস্ত প্রাণটা সেই ঘর হইতে পালাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সে ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল কিন্তু দেবেনবাবু তাহাকে ডাকিলেন; তাঁহারও নয়নে অশ্রু। তিনি অতি গাঢ় স্বরে বলিলেন, "নবেন একটু দাড়াও। কোলে ক'রে পঙ্ককে তুমিই গাড়ীতে তুলে দিয়ে এস।"

পিতার আহ্বান নবেন্দ্রনাথ অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। তাহাকে আবার ফিরিতে হইল। ফাঁসির হুকুম শুনিয়া হত্যাকারীর মুখখানা যেমন সাদা হইয়া যায়, পিতার আদেশ শুনিয়া তাহারও

গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। পঙ্কজিনীর বিবাহের পর হইতে নরেন্দ্রনাথের প্রাণের সুখ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সে যে ব্যথা পাইয়াছে যদিও তাহা মুখ ফুটিয়া কাহারও নিকট বলে নাই, কিন্তু তাহা পঙ্কজিনীর নিকট অবিদিত ছিল না। তাহার নয়নের সে শূন্য দৃষ্টি পঙ্কজিনীর নিকট সব কথাই বলিয়া দিয়াছিল।

সন্ধ্যা বহুক্ষণ হইয়া গিয়াছে। সারি সারি রাশি রাশি সৌধ শিখর পরিবেষ্টিত কলিকাতা নগরীর রাজপথের গ্যাসালোকগুলি হেলিয়া দুলিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া কলিকাতা মহা নগরীকে রজনীর কোল হইতে টানিয়া আনিয়া তাহার তিমির বসন খুলিয়া দিতেছিল। নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। শূন্য ঘর,—ঘরে জনপ্রাণী নাই। গৃহের গ্যাস তখনও জ্বালা হয় নাই, ঘরখানা একেবারে অন্ধকারের ভিতর ডুবিয়া গিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ গাঢ় অন্ধকার গৃহে পা টিপিয়া টিপিয়া প্রবেশ করিল। হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া অনেক খুঁজিয়া বহু কষ্টে প্রাচীর গাত্রস্থিত বৈদ্যুতিক আলোর সুইচটা বাহির করিল এবং সুইচ্ টিপিয়া আলোটা জ্বালিয়া দিল। আলোটা জ্বলিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘরখানা যেন একেবারে অন্ধকারের ভিতর হইতে গা ঝাড়া দিয়া হাসিয়া উঠিল। নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে যাইয়া সোফার উপর বসিয়া পড়িল। যেন একটা কিসের চিন্তায়,—যেন একটা কিসের বেদনায় তাহার সমস্ত মুখখানার উপর একটা কালির ছোপ ধরিয়া গিয়াছিল।

সে বেদনাটা, সে চিন্তাটা যে কিসের অনেকেই নরেন্দ্রনাথকে সে প্রশ্ন করিয়াছে,—সেও প্রাণের নিকট সে কথা বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াও কোনই সদুত্তর পায় নাই।

বাল্যকাল হইতেই সমস্ত জিনিষ এলোমেলো করা তাহার স্বভাবের একটা প্রধান দোষ ছিল। আলমারী কিম্বা সেল হইতে সে যাহা কিছু টানিয়া নামাইত, তাহা আর যথাস্থানে তুলিয়া রাখা তাহার দ্বারা কোন দিনই ঘটিয়া উঠে নাই। পঙ্কজিনী প্রত্যহ দুই তিনবার নরেন্দ্রের ঘরখানা গুছাইয়াও তবও ঘরখানা গুছাইয়া উঠিতে পারিত না। সে আজ তিন মাস শ্বশুরালয়ে চলিয়া গিয়াছে, আজ তিন মাস আর কেহ তাহার ঘরখানা একবারের জন্যও গুছায় নাই। ভৃত্য প্রাতে ও বৈকালে নাম মাত্র ঝাঁট দিয়া গিয়াছে। যে জিনিষটা যেখানে আসিয়া পড়িয়াছে, আজ পর্য্যন্ত সেখান হইতে তাহা এক ইঞ্চিও নড়ে নাই,—ঠিক সেইভাবেই পড়িয়া আছে। আলমারী হইতে এক একটা করিয়া সমস্ত জিনিষই প্রায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে ও বাহিরের অনেক আবর্জ্জনা আলমারীতে স্থান পাইয়াছে। এইরূপে ঘরখানা ঠিক যেন একটা পুরাতন জিনিষ বিক্রয়ের দোকানের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া, ঘরের অবস্থা দেখিয়া বিদ্যুতের মত আবার একবার পঙ্কজিনীর কথাটা নরেন্দ্রনাথের প্রাণের ভিতর চমকাইয়া উঠিল। নরেন্দ্রনাথ ধনীর পুত্র,—তাহার গৃহে দাসদাসীর অভাব নাই,—সকলেই আছে, শুধু একটী বালিকার

তিনি হাসিয়া অতি স্নেহের স্বরে বলিলেন, "তা'হ'লে আমি যাই, সব ঠিক ঠাক ক'রে ফেলিগে। বিয়েটা এখন যত শিগ্‌গির হয় ততই ভালো। এত দিন পক্ষী ছিল, সে সমস্ত বাড়ীময় দিনরাত হেসে খেলে বেড়াত, সে নেই কাজেই বাড়ীটা বড়ই ফাঁকা ফাঁকা হয়ে পড়েছে। তোর একটী বৌ ঘরে এনে দাহ'ক তাকে নেড়ে চেড়ে পক্ষীর অভাবটা অনেকটা ভুলতে পারবো। যাই ওঁকে গিয়ে তা' হ'লে বলিগে যে, নরু বিয়ে কর্ত্তে রাজি হয়েছে। যেমন করে পা'র কালই আমি ওঁকে ক'নে দেখ্‌তে পাঠাব। নে উঠে বোস, মুখখানি একেবারে শুখিয়ে গেছে। সেই কোন সকালে খেয়ে বেরিয়েছিলি, ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি? যাই আমি তোর খাবারের বন্দোবস্ত করিগে।"

কাত্যায়নী গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন, নরেন্দ্রনাথ সোফার উপর আবার কাৎ হইয়া পড়িল। জননী চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে রাশি রাশি চিন্তা যেন চারিপার্শ্ব হইতে ছুটিয়া আসিয়া, তাহার মাথাটা দখল করিয়া বসিল। একটি চিন্তার উনিশ-বিশের জন্য,—একটু ভুল করিয়া সে জীবনের সমস্ত সুখ হারাইতে বসিয়াছে, আবার জননীকে বিবাহে সম্মতি দিয়া আর এক ভুল করিল কিনা কে তাহার মীমাংসা করিবে। কিন্তু ভুল দিয়া ভুল সারা ব্যতীত তাহার আর অন্য উপায় নাই,—সে আর কিছুতেই এরূপ ভাবগ্রস্ত জীবন বহন করিতে পারে না। হৃদয়ের সবটা স্থান জুড়িয়া পঙ্কজিনী বসিয়া ছিল, সে চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সে স্থানটা একেবারে শূন্য হইয়া পড়িয়াছে যে,

তাহার সমস্ত প্রাণ অরুণরাগ রেখার মত পরিষ্কার হইয়া উঠিতে ছিল, তখন পঙ্কজিনীর জীবনাকাশে সুখসূর্য্য অস্তমিত হইয়া নিরাশার গাঢ় অন্ধকারে সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবার সূচনা হইতেছিল। নরেন্দ্রনাথের বৌভাতের আনন্দ যখন গান বাজনা ও প্রীতিভোজের ধূমে মুখরিত হইয়া উঠিয়া ছিল, সেই সময় দেবেনবাবু পঙ্কজিনীর শ্বশুরালয় হইতে এক 'তার' পাইলেন, "পঙ্কের স্বামী সহসা কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। রোগ মারাত্মক। অবিলম্বে পঙ্কজিনীকে যেন পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা হয়।"

'তার' পড়িয়া দেবেনবাবু একেবারে বসিয়া পড়িলেন। পুত্রের বিবাহের সমস্ত আনন্দ নিমিষে যেন একটা নিরানন্দের আবরণে ছাইয়া ফেলিল। রোগ সাংঘাতিক,—এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিবার উপায় নাই, যে কোন উপায়ই হউক পঙ্কজিনীকে তখনই শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে হইবে। তিনি একটা গাঢ় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দ্বিতলের সজ্জিত হল কামরার ভিতর বসিয়া পঙ্কজিনী নববধূকে মনের মত করিয়া ফুল-শয্যার সাজে সাজাত করিতেছিল। নরেন্দ্রনাথের বিবাহের আনন্দের ভিতর সে এ কয়দিন নিজেকে একেবারে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল। তাহার নরেনদার বিবাহ,—নরেনদা সুখী হইবে, নরেনদার মনের মত টুকটুকে বৌ আসিয়াছে, এ আনন্দ তাহার রাখিবার স্থান নাই। তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় সে আনন্দের তরঙ্গে একেবারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার বিবাহের পর, সে আর নরেনদার মুখে একদিনের জন্যও হাসি দেখিতে পায়

নাই, সেই নরেনদার মুখে আবার হাসি ফুটিবে, ইহাতেই সে একেবারে বিভোর হইয়া গিয়াছিল। জগতের সমস্ত দুঃখ বেদনা আজ তাহার নিকট হইতে দূরে,—বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে। সে এক মনে নববধূকে সাজাইতে ছিল, সহসা দেবেনবাবুর গৃহ প্রবেশের শব্দে, সে মুখ তুলিয়া চাহিল। দেবেনবাবুর সমস্ত মুখখানার উপর চিন্তা রেখা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ম্লান বিশুষ্ক মুখের দিকে চাহিবামাত্র পঙ্কজিনীর যেন একটা অজানিত আশঙ্কায় সমস্ত বুকটা দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে ভীতা হরিণীর ন্যায় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেবেনবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "জ্যাটামশাই আপনার মুখ এত শুক্‌নো কেন? অসুখ করেছে বুঝি?"

দেবেনবাবু পঙ্কজিনীর মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন, তিনি যে দুঃসংবাদ লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা মুখ হইতে বাহির করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল। নবেন্দ্রনাথের বিবাহের আনন্দে পঙ্কজিনী জগৎ সংসার ভুলিয়া রহিয়াছে, এ সময় সেই দুঃসংবাদ তিনি কেমন করিয়া তাহাকে প্রদান করিবেন? কিন্তু সংবাদ না দিলেও নয়;—রোগ কঠিন না হইলে এমন দিনে পঙ্কজিনীর শ্বশুর কখনই তাহাকে 'তার' করিতেন না। দেবেনবাবু নিজেকে একটু দৃঢ় করিয়া কোনক্রমে বলিয়া ফেলিলেন, "মা বড় খারাপ খবর পেলুম। তোমাকে এখনি শ্বশুর-বাড়ী যেতে হবে। বাবাজির নাকি হঠাৎ কলেরা হয়েছে। তোমার শ্বশুর মশাই তোমাকে পাঠিয়ে দেবার জন্য আমায় 'তার' করেছেন।"

নরেন্দ্রনাথ কোন কথা কহিল না। দেবেনবাবু কোচম্যানকে গাড়ী হাঁকাইতে বলিলেন, গাড়ী ষ্টেশনের দিকে ছুটিল। গাড়ী চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের প্রাণের সমস্ত আলো, কে যেন ফুৎকার দিয়া নিবাইয়া দিল,—চিন্তা রাক্ষসী যেন একটা আতঙ্কের পোষাক পরিয়া তাহার কর্ণে শত কুকথা গাহিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথের কেবলই মনে হইতে লাগিল, পঙ্ক তাহার জীবনের সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিয়া ব্রহ্মচারিণী সাজিতে চলিয়া গেল। তাহার মলিন মুখখানি আর কোন দিন হাস্য রেখায় রঞ্জিত হইবে না,—তাহা চির দিনের মত মলিন হইয়া রহিবে। তাহার ফুলশয্যার প্রীতিভোজ সমস্তই যেন চক্ষের সম্মুখে একেবারে একেকার হইয়া গেল। সে একটা গাঢ় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া টলিতে টলিতে আসিয়া বৈঠকখানা গৃহের ফরাশের উপর বসিয়া পড়িল। দেবেন-বাবু পঙ্ককে লইয়া চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ-বাটীর সমস্ত আনন্দ-কোলাহল যেন একটা অজানিত নিরানন্দের ভিতর ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতে লাগিল। দেবেন বাবু নাই,—নরেন্দ্রনাথ থাকিয়াও না থাকিবার মত, কাজেই সমস্তই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব নিমন্ত্রণ উপলক্ষে যাঁহারা আসিয়াছিলেন,—তাঁহাদের অর্দ্ধেকের আহার হইল অর্দ্ধেকের হইল না। দুঃসংবাদটা যাহাদের কর্ণে পৌছিয়া ছিল তাঁহারা দুঃখীত হইয়া, দুইবার 'আহা' বলিয়া গৃহে ফিরিলেন,—যাহাদের কর্ণে পৌছায় নাই তাহারা মহা বিরক্ত হইয়া 'এমন নিমন্ত্রণে আবশ্যক কি' প্রভৃতি বলিতে বলিতে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। নরেন্দ্রনাথ সেই যে

গৃহের দরজাটা টানিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। দরজা বন্ধের শব্দে নবেন্দ্রনাথ দরজার দিকে চাহিল। দরজার শিকল যে বাহির হইতে পড়িল তাহার শব্দটুকুও তাহার কর্ণে আসিল। সে একবার গৃহের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, গৃহের মধ্যস্থলের প্রকাণ্ড ঝাড়ে বিদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছে,—সেই আলোয় সমস্ত ঘরখানা একেবারে জ্বলজ্বল করিতেছে,—সেই আলোর নিম্নে পালঙ্কের উপর, ছিন্নফুলের শয্যার উপর ফুলসাজে সজ্জিত লালিত্যময়ী শায়িত, তাহার সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত। সেই বস্ত্রাচ্ছাদিত মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র আবার পঙ্কজিনীর কথা যেন বিদ্যুতের মত নরেন্দ্রনাথের অন্ধকার হৃদয়াকাশে চকমক করিয়া উঠিল। তাহার মুখের একটা কথায় যেখানে পঙ্কজিনী শুইতে পারিত, সেখানে আজ তাহার এক সম্পূর্ণ অপরিচিত অজানা বালিকা আসিয়া শয়ন করিয়াছে। সে কেমন,—সে কি তাহার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিতে পারিবে? কে যেন নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ের ভিতর অতি কঠোর স্বরে বলিয়া উঠিল, "না—না—না। হীরকের স্থান কি কাচখণ্ডে কোন দিন পূর্ণ হইয়াছে।"

একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, চিন্তার বোঝাটাকে দেহ হইতে নামাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া, নরেন্দ্রনাথ উঠিয়া দাড়াইল। তাহার পর ধীরে ধীরে পালঙ্কের উপর উঠিয়া লালিত্যময়ীর পার্শ্বে যাইয়া শয়ন করিল। সে বহুক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া নিদ্রা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল,—কিন্তু নিদ্রা চক্ষে আসিল না। চিন্তাদেবী যেন ষড়যন্ত্র করিয়া, বিজিত সেনার

করিয়া উত্তর দিল, "না ঘুম পাবে কেন! জ্বালাতন,—কাণের গোড়ায় শুধু ঘ্যানর ঘ্যানর—বাবারে কি জ্বালায়ই পড়েছি!"

বধূর মুখ চোখের ভাবে,—কণ্ঠের স্বরে, নরেন্দ্রনাথ একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল। আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হইল না। সে কেবল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িল। চিন্তার আগুণ তখন তাহার প্রাণের ভিতর হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সেই আগুণে তাহার সমস্ত হৃদয়টা যেন একেবারে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতে লাগিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল জগতে একটুও শান্তি নাই,—সমস্ত জগৎ জুড়িয়া কেবলই অশান্তির ঢেউ বহিতেছে।

করিতে অসমর্থ হইল। তিনি আর একটু হইলেই ভূপতিত হইতেন,—তাড়াতাড়ি দরজাটা ধরিয়া ফেলিলেন। ক্রন্দনের স্বর কর্ণে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে পঙ্কজিনী গাড়ীর ভিতর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল, কয়েকজন ললনা আসিয়া ধরাধরি করিয়া তাহার মূর্চ্ছিত দেহ অন্তঃপুরের মধ্যে লইয়া গেল। দেবেন-বাবু পলকশূন্য নয়নে কাট হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বৃদ্ধ নায়েব মহাশয়ের স্বর কর্ণে প্রবেশ করায় একটা দীর্ঘনিশ্বাস যেন তাঁহার হৃদয়ের সবখানি ব্যথা বাহিরে টানিয়া বাহির করিয়া আনিল, তিনি ফ্যালফ্যাল করিয়া নায়েব মহাশয়ের দিকে চাহিতে লাগিলেন, ভাল মন্দ কিছুই জিজ্ঞাসা কবিতে পারিলেন না। নায়েব মহাশয় অতি করুণ স্বরে বলিলেন, "চলুন, বৈঠকখানায় বসবেন চলুন।"

দেবেনবাবু নায়েব মহাশয়ের কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, তাঁহার কণ্ঠ শুখাইয়া কাট হইয়া গিয়াছিল। তিনি বড় সাধ করিয়া, অনেক দেখিয়া শুনিয়া পঙ্কের বিবাহ দিয়া ছিলেন, তাঁহার বড় আশা ছিল পঙ্ক সুখে থাকিবে, কিন্তু বিধাতা বাধ সাধিলেন। এত খোঁজাখুঁজি, এত দেখা শোনা, এক লহমায় সব শেষ হইয়া গেল। পঙ্কজিনীব ভবিষ্যৎ জীবনেব কথা সহসা তাঁহাব মনে উদয় হওয়ায় তাঁহার সমস্ত দেহটা যেন ঝিমঝিম করিতে লাগিল। তিনি কোন ক্রমে নায়েব মহাশয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধীরে ধীরে যাইয়া বৈঠকখানা গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দাঁড়াইবার আর মোটেই ক্ষমতা ছিল না, গৃহেব ভিতব প্রবেশ করিয়া

ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ফরাশের উপর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

* * * *

যে যায়—সেই কেবল চিরদিনের মত চলিয়া যায়। পৃথিবী তাহার দিকে একবারও ফিরিয়া চাহে না। পৃথিবী পূর্ব্বেও যে ভাবে চলিতেছিল পরেও ঠিক সেইভাবেই চলিতে থাকে,—তাহার কার্য্যের একটুও উনিশ-বিশ হয় না। আজ ঠিক তিন দিন হইল পঙ্কজিনী বিধবা হইয়াছে,—আজ তিন দিন দেবেনবাবু তাহার শ্বশুরালয়ে বাস করিতেছেন,—কিন্তু আর তিনি এখানে কিছুতেই অপেক্ষা করিতে পারেন না। পুত্রের বিবাহের ফুল-শয্যার রাত্রে তিনি চলিয়া আসিয়াছেন, সেখানে কি হইতেছে না হইতেছে তাহার কিছুই সংবাদ পান নাই; কলিকাতায় ফিরিবার জন্য তাহার সমস্ত প্রাণটা তাই একেবারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি পূর্ব্বেই কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতেন, কিন্তু পঙ্কজিনীকে সঙ্গে লইয়া ফিরিবেন ভাবিয়াই এ কয় দিন তাঁহাকে এখানে অপেক্ষা করিতে হইয়া ছিল। পঙ্কজিনীর শ্বশুর একমাত্র পুত্র হারাইয়া একরূপ পাগলের মত হইয়াছিলেন, তিনি এ কয়দিনের ভিতর এমন একটুও অবসর পান নাই যে, তাঁহার মনের উদ্দেশ্যটা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করেন। অথচ পঙ্কজিনীকে ফেলিয়াও যাইতে পারেন না। শ্বশুরালয়ের সহিত যখন তাহার সমস্ত সম্পর্ক উঠিয়া গেল,—তখন আর সে এখানে কি করিতে থাকিবে! অতি প্রত্যূষে উঠিয়া দেবেনবাবু সেই সকল কথাই

আমার সর্ব্বস্ব,—তাঁর মুখে আমি শিশিরের মুখ দেখ্‌তে পাবো।”

অভয়বাবু নীরব হইলেন, দেবেনবাবুও আর কোন কথা কহিলেন না। সমস্ত ঘরখানা যেন একটা নীরব বেদনায় নিঝুম হইয়া পড়িল। অভয়বাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া হাঁকিলেন, “ওরে কে আছিস। বৌমাকে একবার এইখান পাঠিয়ে দে।”

দ্বারের পার্শ্বেই ভৃত্য দাঁড়াইয়া ছিল,—সে বাবুর আদেশ পাইয়া অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল, “বৌমা ঠাক্‌রুণকে বাবু ডাক্‌ছেন।”

শ্বশুরের আহ্বান সংবাদ পাইয়া পঙ্কজিনী আসিয়া ধীরে ধীরে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। দেবেনবাবু দ্বারের দিকে চাহিয়া ছিলেন,—তাঁহাব দৃষ্টি পঙ্কজিনীর উপর পতিত হইল। আজ তিন দিন তিনি পঙ্কজিনীকে দেখেন নাই। আজ সহসা তাহাকে দেখিয়া তিনি যেন তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। এই তিন দিনে তাহার আকাশ পাতাল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। তাহার মুখে আর সে হাসি,—সে আনন্দ নাই, বিষাদ তথায় মনের সাধে আপন রাজ্য পাতিয়া সে মধুর হাসির সবটুকু একবারে হরণ করিয়া লইয়াছে। অঙ্গে একখানিও অলঙ্কার নাই,—শুভ্র থান পরিহিত,—এলায়িত রুক্ষ কেশ,—অঙ্গের প্রতি ভঙ্গিমায় একটা স্থির, ধীর, গাম্ভীর্য্য বিরাজ করিতেছে। পঙ্কজিনীর এই মূর্ত্তির পানে চাহিয়া দেবেনবাবুর সমস্ত প্রাণটা যেন কাঁদিয়া উঠিল।

পাইনি। তোমায় আর মা কি বলবো, কেমন থাকো মাঝে মাঝে এক একখানা চিঠি দিও।”

পঙ্কজিনী তথাপি কোন কথা কহিল না। অভয়বাবু দেবেনবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “না আপনাকে আর থাকৃতে বল্‌তেও পারি না। আমার যা অবস্থা তাতে তো আমি কিছুই দেখ্‌তে শুন্‌তে পাচ্ছিনি। এখানে থেকে শুধু শুধু কষ্ট করবার আপনার কোন দরকার নেই।”

তারপর পঙ্কজিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “যাও মা বাড়ীর ভেতর যাও। তোমার জ্যাঠামশাই যাবেন আজ রাত্রে। যাবার আগে তাঁর সঙ্গে আবাব তোমার দেখা হবে।”

শ্বশুরের কথা শেষ হইবামাত্র পঙ্কজিনী ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। দেবেনবাবু সারাদিন নানা চিন্তায় অতিবাহিত করিয়া, একরাশ বেদনা বুকে পুরিয়া, রাত্রের গাড়ীতে একাকী কলিকাতায় ফিরিলেন। আসিবার সময় পঙ্কজিনীর যে ম্লান মুখখানি দেখিয়া আসিয়াছিলেন, গাড়ীতে সারা রাত্রি ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাই কেবল তাঁহার চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

যে তাঁহার চক্ষে জল আসিয়া পড়িত, কিন্তু তথাপি নীরবে তিনি সবই সহ্য করিতেছিলেন। তিনিই দেখিয়া শুনিয়া লাল টুক্‌টুকে বৌ গৃহে আনিয়াছেন, এখন আর অনুতাপ করিলে কি হইবে! দুঃখের কথাটা মুখ ফুটিয়া জানাইবারও তাঁহার আর মুখ ছিল না। কাত্যায়নী নীরবে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া কিছুক্ষণ বধূর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ বৌমা, এমন সময় বসে ট্রাঙ্ক গুচুচ্ছো কেন? নরুর বার্লিটা একটু গরম করে আন্‌লেও তো পারতে। সে একলাটী পড়ে আছে, একটু পাশে বসে মাথাটায়ও তো হাত বুলিয়ে দিতে পার্‌তে।"

শাশুড়ীকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া বঙ্কিম গ্রীবায় লালিত্যময়ী শাশুড়ীর মুখের দিকে চাহিয়াছিল, অতি কর্কশ কণ্ঠে উত্তর দিল, "দিন রাত রুগীর পাশে বসে থাকা আমার কর্ম্ম নয়, চুপটি ক'রে বসে মাথায় হাত ফাত বুল্‌তে আমি পারবো না। তারপর আমার যখন ব্যালো হবে তখন দেখ্‌বে কে? তাছাড়া আস্‌ছে সোমবার আমার পিস্‌তুতো ভায়ের বিয়ে, আমাকে কালই সেখানে যেতে হবে—"

বধূর কথায় কাত্যায়নী একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন, স্বামী মৃত্যু শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিতেছে, তবুও মানুষের পিস্‌তুতো ভায়ের বিবাহের আনন্দ করিতে যাইতে ইচ্ছা হয়। বধূর কথায় কাত্যায়নীর সমস্ত বুকটা কাঁপাইয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, তিনি মহা বিস্মিত স্বরে বলিলেন, "সে কি

কথা, নরুকে এই অবস্থায় ফেলে তুমি তোমার পিস্‌তুতো ভায়ের বিয়েতে যাবে? যেতে ইচ্ছেও তো মানুষের হয়! ডাক্তার কি বলেছে তা তো সবই শুনেছো।”

কাত্যায়নী আর বলিতে পারিলেন না, দুই ফোটা অশ্রু তাঁহার নয়ন বহিয়া গড়াইয়া পড়িল। লালিত্যময়ী মুখখানা ভার করিয়া বলিল, “শুন্‌বো না কেন, ডাক্তাব এমন আর কি বলেছে, বলেছে এখন তেমন বিশেষ—”

বধূর উত্তর শুনিয়া, আর কোন কথা কহিতেই কাত্যায়নীর ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু পুত্রের মুখ চাহিয়া তিনি ধীরে ধীরে আবাব বলিলেন, “ডাক্তার যাই বলুক, তুমিতো সব দেখতে পাচ্ছ, নরুর এই দশা দেখে যাবে কি করে? সেখানে গিয়ে সুস্থির হয়ে থাক্‌তে পার্‌বে? মানুষে কি এ পারে? তা ছাড়া কাল আমরা নরুকে নিয়ে হাওয়া বদলাবার জন্যে মধুপুর যাব, আর তুমি এই সময় বাপের বাড়ী চলে যাবে?”

লালিত্যময়ী ঠোঁট দুইখানি উল্‌টাইয়া বলিল, “মা এত করে লিখেছে আমায় যেতেই হবে। আমার পিসে মশায়ের ওই একটী মাত্র ছেলে, মা লিখেছে বিয়েতে খুব ধুম হবে, আমি না গেলে পিসিমা ভারি দুঃখ করবেন। মারও মনে কষ্ট হবে।”

বধূর উপরে যেটুকু শ্রদ্ধা কাত্যায়নীর এত দিন ছিল, বধূর এই কথাবার্ত্তায় সেটুকুও তাঁহার নষ্ট হইয়া গেল। ক্ষোভে, দুঃখে, ঘৃণায় তাঁহার নয়ন ফাটিয়া জল আসিবার মত হইল। তিনি অশ্রু জড়িত কণ্ঠে, বেশ একটু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “তোমার

জননীর প্রাণ, পুত্রের একটুখানি অমঙ্গলের সূচনা হইলে কেমন করিয়া উঠে তাহা অপরের অনুভব করা অসম্ভব। কাত্যায়নীর নয়নে জল আসিল, তিনি মহা ব্যাকুল কণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি অমন করে নিশ্বেস ফেল্‌লে কেন? তবে কি নরু আমার বাঁচবে না? ডাক্তার সাহেব কি তাই বল্লেন?"

কাত্যায়নীর কণ্ঠস্বর জড়াইয়া আসিতেছিল, তাঁহার স্বর বন্ধ হইয়া গেল, তিনি শুধু একটা ব্যাকুল দৃষ্টি লইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন। দেবেনবাবু পত্নীর সেই দৃষ্টির ভিতর কত বেদনা লুক্কাইত তাহা বুঝিলেন। বেদনার ভারে তিনি নিজেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে ছিলেন, তথাপি প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে একটু দৃঢ় করিয়া লইয়া বলিলেন, "বাঁচা মরা ভগবানের হাত, কে বাঁচবে, কে মরবে মানুষের বলা তা কঠিন। ডাক্তারেরা বলেন এ রোগের ওষুধ নেই। এ রোগের একমাত্র ওষুধই হচ্চে জল বায়ু পরিবর্ত্তন। তাই কাল নরুকে নিয়ে মধুপুরে যাব, শুনেছি সেখানকার জল বায়ু নাকি খুব ভাল। গিন্নি ভগবানকে ডাক, তিনি যদি নরুকে নেন, তোমার আমার সাধ্যি কি যে তাকে আট্‌কে রাখ্‌তে পারি।"

স্বামীর কথায় কাত্যায়নী একেবারে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার নিশ্বাস দ্রুত পড়িতে লাগিল। দেবেনবাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "নরুর জ্বর কি আর বেড়ে ছিল?"

কাত্যায়নী বড় একটা নিশ্বাস ফেলিয়া, উত্তর দিল, "হাঁ, আজও দুপুর থেকে জ্বর বেড়েছে, এখনও তো খুব জ্বর রয়েছে।"

দশম পরিচ্ছেদ

বাতাসে সম্মুখের জানালাটা একটু ফাঁক হইয়া গিয়াছিল, নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি সেই ফাঁকটুকুর ভিতর দিয়া নিবিড় কালো আকাশেব উপর যাইয়া পড়িল। আজ তিন চারি মাস বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া সে কেবলই রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, অন্ধকার রাত্রের এমন আকাশ সে কতদিন দেখে নাই। কিছুক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহাব যেন মনে হইতে লাগিল, আকাশ মৃত্যুর পোষাক পরিয়া আজ তাহার সম্মুখে একবারে তাহার কালো বুকখানার সবটুকু বিস্তারিত করিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশ্বব্যাপী এই বিরাট অন্ধকারের ভিতর জগতেব সমস্ত আলো অতি শীঘ্রই তাহার চক্ষের সম্মুখে একেবারে চিরদিনের মত কালো হইয়া যাইবে। সকলই সকল দেখিতে পাইবে, সেই কেবল দেখিতে পাইবে না। স্নেহ, মমতা, ভালবাসা বিশ্বের যাহা কিছু বন্ধন ক্রমেই যেন তাহার সমস্তই শিথীল হইয়া পড়িতেছে, দুই দিন পরে একেবারেই ছিন্ন হইয়া যাইবে। ওই কালো আকাশের কোটী তাবা মিট মিট করিয়া আজ যেন তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। সহসা সেই কালো আকাশের একটা বড় তারা তাহার চক্ষের উপরে বেশ একটু জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল;—সেই তারার ভিতর হইতে একখানি তাহার বড় পরিচিত,—বড় আপনার মুখ যেন উঁকি দিল। সে মুখখানি

এ সময় তার পিস্‌তুতো ভায়ের বিয়েতে চলে গেল,—স্বামীর এ অবস্থা দেখে কখন যে কোন স্ত্রী বিয়ের আমোদ কর্ত্তে যেতে পারে, এমন কথা কখনতো কারুর মুখে মা কোন দিন শুনিনি। চিরদিন মা শুনে এসেছি, স্বামীর পায়ে একটু কাঁটা ফুট্‌লে সে বেদনাটুকুও স্ত্রী অনুভব করে। তবে মা এমন হ'লো কেন? সে বড় ছেলে মানুষ, সে হয়তো মা বুঝতেই পাচ্ছে না যে, দুদিন পরে তাব সব আমোদ প্রমোদ ফুরিয়ে যাবে।"

কাত্যায়নী পুত্রের কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না,—টস্‌টস্ করিয়া কেবলই তাঁহার নয়ন ফাটিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল,—"মা আমার মনে হয়, মানুষ সব কথা সব সময় বুঝতে পারে না। তারা না বুঝে এমন অনেক কাজ করে বসে যার জন্যে চিরদিন অনুতাপ করেও শেষ কর্ত্তে পারে না। তাই মা আমার সময় সময় মনে হয় এই পৃথিবীটা বুঝি সব মিথ্যে দিয়ে ঢাকা! সত্য জিনিষ এখানে নেই বল্‌লেই হয়। যদি দুই একটা থাকে তাও চিনে নেওয়া কঠিন।"

কাত্যায়নী কোন ক্রমে তাঁহার অশ্রু দমন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—"ঘুমো না নরু, রাত যে ঢের হ'লো। রাত জাগ্‌লে আবার অসুখ বাড়বে।"

জননীর কথায় পুত্রের মুখের উপর একটু মৃদু হাসির ছায়া পড়িল,—নরেন্দ্রনাথ মৃদু স্বরে বলিল, "অসুখ বাড়বার মা আর

সে এখন সামলাতে পারিনি। এ সময় তাকে আমার অসুখের কথা জানানো ভাল হয়নি। মা সেতো তার সব সুখই জলাঞ্জলী দিয়েছে,—এ সময় তাকে একটু শান্তি পাবারও অবসর দেওয়া উচিত ছিল।"

নরেন্দ্রনাথ আবার একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা এখন রাত্তির কটা ?"

গৃহের প্রাচীরের গাত্রে ব্রাকেটের উপর ঘড়ী রাত্রের পরিমাণ জ্ঞাপন করিয়া ক্রমাগত টিক্‌টিক্ করিতেছিল। কাত্যায়নী একবার ব্রাকেটের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "রাত্তির এখন ন'টা।"

নরেন্দ্রনাথ আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সবে ন'টা। আমি ভাবছিলুম বুঝি রাত্তির বারটা একটা বেজে গেছে। তবে মা তুমি আমার ঘুমের জন্যে অত ব্যস্ত হয়েছিলে কেন ? রাত্তির তো এখন মোটেই হয়নি।"

কাত্যায়নী পুত্রের কথার উত্তরে আবার কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় দরজাটা ধীরে ধীরে একটু ফাক্ হইয়া গেল ;—গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন দেবেনবাবু। তিনি আর সে দেবেনবাবু নাই, পুত্রের কথা চিন্তা করিয়া করিয়া বার্দ্ধক্য আসিয়া তাঁহাকে একেবারে জড়ীভূত করিয়া দিয়াছে। গৃহের ভিতরকার আলোটা অতি মৃদুভাবে জ্বলিতেছিল,—তিনি সেটাকে একটু সতেজ করিয়া দিয়া, পত্নীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নরু কি ঘুমিয়েছে ?"

কাত্যায়নী মাথাটা নাড়িয়া উত্তর দিলেন, "না।"

কঠিন রোগের অব্যর্থ ওষুধ আছে। কাল একবার তাঁর কাছে যাব। তাঁকে যদি একবার নরুকে দেখাতে পারি—দেখি একবার চেষ্টা করে।”

কাত্যায়নীর চারিপার্শ্বে নিরাশার অন্ধকার একেবারে কালো হইয়া উঠিয়া ছিল, স্বামীর কথায় তাহারই ভিতর যেন একটু আলো চিক্‌মিক্ করিয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, “হাঁ, তা হ’লে কালই একবার তাকে নিয়ে এস। অত বড় রাজার যখন তিনি কবিরাজ তখন নিশ্চয়ই তিনি মস্ত জ্ঞানী লোকই হবেন।”

দেবেনবাবু মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, “হওয়াই সম্ভব। তবে তিনি আস্‌বেন কিনা বল্‌তে পারিনি। দেখি কি হয়।”

কাত্যায়নী কোন উত্তর দিলেন না, দেবেনবাবু একটুখানি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, দরজার নিকট যাইয়া ফিরিলেন, পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “নরুকে ওষুধ একদাগ খাইয়ে দেওয়া হয়েচে?”

কাত্যায়নী ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিলেন, “হাঁ।”

দেবেনবাবু আর কোন কথা কহিলেন না। তিনি পুত্রের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। নরেন্দ্রনাথ চক্ষু মুদিয়া শুইয়া ছিল, দরজা খোলার শব্দে চক্ষু মেলিয়া চাহিল। কালো আকাশের তারাগুলি করুণা বিগলিত চখের জলের মত, তাহার চক্ষের সম্মুখে জ্বল জ্বল করিয়া উঠিল। সে

একাদশ পরিচ্ছেদ

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত রোগ যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া শেষ রাত্রে নরেন্দ্রনাথের একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। একখানি কোমল নারী হস্ত স্পর্শে যখন সে চোখ মেলিয়া চাহিল,—তখন প্রভাতের রৌদ্র উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া মেঝের উপর লুটোপুটি খাইতেছিল। চক্ষু মেলিয়া নরেন্দ্রনাথ শিয়রের নিকট যাহাকে দেখিল তাহা যেন তাহার স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইল। প্রত্যহই সে আশে পাশে যাহাকে দেখিতেছে, সেই তাহার শিয়রে বসিয়া তাহার কোমল হস্তে ধীরে ধীরে তাহার মস্তকে হাত বুলাইয়া দিতেছে। নরেন্দ্রনাথ স্থির দৃষ্টিতে সেই মূর্ত্তিখানির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া একটা আকুল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ফোঁটা অশ্রু তাহার গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িল।

নরেন্দ্রনাথের সঙ্কট পীড়ার সংবাদ পৌঁছিবামাত্রই পঙ্কজিনী রওনা হইয়াছিল, সে যখন মধুপুরে দেবেনবাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল, তখনও রাত্রি শেষ হইবার কিছু বাকি ছিল,—নরেন্দ্রনাথ সেই সবে মাত্র নিদ্রিত হইয়াছে। নরেন্দ্রনাথের মৃত্যু মলিন পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া পঙ্কজিনীর বুকটা ফাটিবার মত হইল। পাছে তাহার নরেনদার নিদ্রা ভঙ্গ হয়, সেই আশঙ্কায় সে একটীও কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে যাইয়া পাষাণের মত তাহার শিয়রের নিকট বসিয়াছিল;—তাহার পর

হচ্ছে,—বুঝি এমন সকাল আমার জীবনে আর কখন এমন হয়ে ফুটে ওঠেনি। আজ যেন আমার সমস্ত প্রাণ ভরে উঠছে। তুই আজ বোন তোর সমস্ত দেহটাকে পবিত্র করে নিয়ে ব্রহ্মচারিণী বেশে আমার রোগ শয্যায়,—আমার শিহরে এসে বসেছিস্। তোরই কোলের কাছে মাথা রেখে,—তোকে প্রাণভবে দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার শেষ নিশ্বাস পৃথিবীতে চিরদিনেব মত শেষ হয়ে যাবে ;—এর চেয়ে আর মানুষের বেশী কি সুখ হতে পারে বোন! এর অধিক চাইবার মত আর তো কিছু আমি ভগবানের কাছেও খুঁজে পাইনি। তোকে এই চির দুঃখিনী বেশে, চিরদিন আমায় দেখ্‌তে হবে। বেঁচে আর আমার লাভ কি বোন! তার চেয়ে যে মৃত্যু আমার মহা আনন্দের। ভগবানের কাছে শুধু এইটুকু প্রার্থনা করি, জন্মজন্মান্তরে যেন তোরই ভাই হয়ে জন্মাতে পারি। আর তুইও যেন আমার এমনি ধারা বোন হয়ে,—এমনি করে আমার চার পাশে সোণার স্বর্গ গড়ে তুলিস্।”

নরেন্দ্রনাথের সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিয়া আসিল,—কণ্ঠ শুষ্ক হইল, সে আর একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিল। নরেন্দ্রনাথের এই করুণ কথা গুলিতে পঙ্কজিনীর সমস্ত শরীব ক্রমেই শিথীল হইয়া আসিতেছিল, সে প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে একটু দৃঢ় করিয়া, অঞ্চলে চোখের জল মুছিতে মুছিতে অশ্রু জড়িত কণ্ঠে বলিল, “নরেন দা একটু বেদানার বস খাও। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।”

পঙ্কজিনীর স্বরে নরেন্দ্রনাথ আবার চক্ষু মেলিল। পঙ্কজিনী

সে ধীরে ধীরে আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। তাহার গাঢ় নিশ্বাস আরও যেন ঘনঘন পড়িতে লাগিল। কাত্যায়নী নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া পঙ্কজিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "পঙ্কী মাঝে মাঝে নরুব মুখে একটু একটু বেদানার রস দিস্,—আমি যাই ততক্ষণ কাপড়টা ছেড়ে আসিগে। নেপালের মহারাজের প্রধান কবিরাজ মশায়ের আজ আবার নরুকে দেখ্তে আসবার কথা আছে। উনি তাই সকালে উঠেই সেখানে গেছেন। তারও আস্বার সময় হ'লো।"

পঙ্কজিনী কোন উত্তর দিল না,—কেবল একবার ঘাড় নাড়িল। কাত্যায়নী ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। নরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া ছিল, সহসা চক্ষু মেলিয়া পঙ্কজিনীর মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "পঙ্ক, তোর এই বুদ্ধিহীন ভাইটির ওপর রাগ করিস্নি বোন,—অভিমান করিস্নি। তুই তোর এই বুদ্ধিহীণ ভাইটিকে চালাক করবার অনেক চেষ্টা করিছিলি, কিন্তু তবুও তোর ভাই চালাক হতে পারেনি। এইটুকু শুধু মনে রাখিস্ বোন ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করে থাকেন। আমার মনে হয় বোন আমি ভুল করিনি। তুই আমার চিরদিনের বোন,—জন্ম—জন্ম—আমার বোন হয়ে জন্মাস্। এর বেশী আর আমার অন্য কোন সাধ নেই। ভাই বোন এমন সম্বন্ধ পৃথিবীতে বুঝি আর কিছু হয় না।"

পঙ্কজিনী নীরব,—তাহার সমস্ত দেহটা ধীরে ধীরে যেন পাষাণ হইয়া আসিতে ছিল। সে স্থির ধীর পলকশূন্য দৃষ্টিতে

নরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নরেন্দ্রনাথ একটুখানি নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল, "দেখ বোন্, আমার তো দিন ফুরিয়ে এসেছে। দু'দিন পরে কোথায় অজানা কত দূরে চলে যাবো তার কিছুই জানিনি, তবু আমার সে জন্যে কোন দুঃখ হচ্ছে না, শুধু আমার বড় দুঃখ মার জন্যে। আমি আমার মাকে জানি,—তার প্রাণ বড় নরম। তিনি এ দুঃখ সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বেন না,—তার বুক ভেঙ্গে যাবে। আমায় হারিয়ে তিনি নিশ্চয়ই পাগল হ'য়ে যাবেন। দেখিস্ বোন তাকে দেখিস্,—আমার মা যেন না দুঃখ পায়। তার কাছে ।কাছে থেকে তাকে মা বলে ডেকে আমার অভাব জান্‌তে দিস্‌নি।"

নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠ রোধ হইল,—এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু নয়ন কোণে উচ্ছলিয়া উঠিল। পঙ্কজিনী তাড়াতাড়ি অঞ্চলে তাহা মুছাইয়া দিয়া শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বলিল, "ছি নরেনদা তুমি পুরুষ মানুষ—তুমি এত দুর্ব্বল। রোগ হ'লেই যে মানুষ মারা যায়—এ কথা তোমায় কে বলেছে। ব্যম হয়েছে ভালো হয়ে যাবে,—তোমার কি অমন চঞ্চল হওয়া উচিত। তুমি ছাড়া তোমার বাপ মার যে আর কেউ নেই ভাই। ভগবান কখন এত নিষ্ঠুর হতে পারেন না। আমার মন বল্‌ছে তুমি ভালো হ'বে,—তুমি আবার সুখী হবে।"

"সুখী হবো।" নরেন্দ্রনাথ মৃদু হাসিল। তাহার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর অতি ক্ষীণ ভাবে বাহির হইয়া আসিল, "সুখী হ'বো! বল্ বোন কেমন ক'রে সুখী হবো? তুই তোর সব সুখ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পশ্চিমের বৈকালের চড়া রৌদ্র একেবারে ম্লান না হইলেও অনেকটা নরম হইয়া পড়িয়াছিল। সূর্য্যদেব পশ্চিম কোণে দাঁড়াইয়া সমস্ত রশ্মিজাল নিজের ভিতর গুটাইয়া লইয়া ক্রমেই রক্তিম মূর্ত্তি ধারণ করিতেছিলেন। দক্ষিণে বাতাস চারিদিক হইতে এলোমেলো ভাবে বহিয়া যাইতেছিল। গৃহের ভিতর পাঁচটি প্রাণী, কাহারও মুখে কথা নাই, সকলেই নীরব, সকলেরই মুখে একটা কালো ছায়া বেশ একটু কালো হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বহুদূর হইতে কেবল যমরাজের কালো মহিষটার বিকট গর্জ্জন এলোমেলো বাতাসের ভিতর দিয়া ভাসিয়া আসিয়া আশঙ্কায় সমস্ত ঘরখানাকে যেন মাঝে মাঝে স্পন্দিত করিয়া তুলিতেছিল।

নরেন্দ্রনাথের চক্ষু দুইটী মুদ্রিত,—তাহার দ্রুত নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘনঘন পড়িতেছে। তাহার শিয়রে কাত্যায়নী,—অবগুণ্ঠনটা বেশ একটু টানিয়া দিয়া, পুত্রের ম্লান মুখখানির দিকে আকুলভাবে চাহিয়া আছেন। নরেন্দ্রনাথের পায়ের নিকট পঙ্কজিনী, পালঙ্কের পার্শ্বস্থিত একখানি টিপায়ে ঠেস্ দিয়া, ঈষৎ অবগুণ্ঠনে মুখখানি ঢাকিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেবেনবাবু বিশুষ্ক মুখে পালঙ্কের ছত্রীটা ধরিয়া বৃদ্ধ কবিরাজের গম্ভীর মুখখানার দিকে স্থির দৃষ্টে চাহিয়া আছেন। তাঁহারই সম্মুখে একখানা বেতের মোড়ার উপর কবিরাজ মহাশয় উপবিষ্ট, তাঁহারও চক্ষু দুইটী মুদ্রিত। কি

রাখিয়াছে। এই শুভ্র পবিত্র কিশোরীর মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া কবিরাজ মহাশয়েরও দুই নয়ন আর্দ্র হইয়া উঠিল। তাহার মৃদু কণ্ঠস্বর অতি মৃদুভাবে বাহির হইয়া আসিল, "মা, আমার যদি শারীরিক একটু পরিশ্রমে সে ঔষধ প্রস্তুত করা সম্ভব হ'তো, সে পরিশ্রম টুকু কর্ত্তে বৃদ্ধ কখনই কাতর হ'তো না। একটু পরিশ্রম কল্লেই যদি একজন লোক বাঁচতো, তাহ'লে সেটুকু পরিশ্রম কর্ত্তে কখন কোন দিন কি কোন মানুষ বিমুখ হ'তে পারে? মা তুমি ঠিক আমার কথা বুঝতে পারনি। সে ওষুধ প্রস্তুত কর্ত্তে হ'লে যে অনুপানের প্রয়োজন সে অনুপান সংগ্রহ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। সে অনুপান মা পাওয়া যায় না।"

পঙ্কজিনী স্থির দৃষ্টিতে কবিরাজ মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার কথাগুলি শুনিতেছিল, কবিরাজ মহাশয় নীরব হইবামাত্র সে আবার প্রশ্ন করিল, "এমন কি অনুপান যা পাওয়া সম্ভব নয়। একটু চেষ্টা করে খুঁজলে নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। যা টাকা লাগে, যত টাকা লাগে সে জন্যে আপনি চিন্তিত হবেন না; আপনি দয়া করে সেই অনুপানটা সংগ্রহ করুন। আমার নরেনদাদাকে রক্ষা করুন।"

পঙ্কজিনীর কথায় একটা মৃদু হাসি কবিরাজ মহাশয়ের মুখের উপর ভাসিয়া উঠিল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "মা অর্থ বিনিময়ে সে অনুপান সংগ্রহ হয় না। সামান্য অর্থ ব্যয় কল্লেই যদি সে অনুপান সংগ্রহ হ'তো তাহ'লে তা পাওয়া সম্ভব নয় এ কথা বল্‌বো কেন মা। সত্যই সে অনুপান সংগ্রহ করা বড়ই কঠিন।

নিজের দেহের রক্ত দিতে চায় আমরাতো তা নিতে পারিনি মা। এ ঠাকুরের কাছে বুক চিরে রক্ত দেওয়া নয় মা, এতে জীবনের বিশেষ আশঙ্কা আছে। চল্লিশ তোলা রক্ত যদি কোন মানুষের শরীর থেকে নেওয়া হয় তা'হলে সে মানুষ কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারে না। একজনের প্রাণ বিনিময়ে অপরের প্রাণ রক্ষা কি সম্ভব মা, আর তা সম্ভব হ'লেও রাজার আইন তা শুনবে কেন? এক জনের প্রাণ রক্ষার জন্যে আর একজনের দেহের রক্ত নিলে রাজার আইনে গুরুতর অপরাধ হয়,—তার দণ্ড তো সহজ নয় মা।"

নরেন্দ্রনাথ একটা আকুল দৃষ্টি লইয়া পঙ্কজিনীর সেই উদ্দীপ্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া ছিল, সে দেখিল বৈকুণ্ঠের সমস্ত আলো আসিয়া সেই মুখখানিকে একেবারে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। সে মুখখানি স্বর্গের শত মাধুরীতে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। সে কাতর কণ্ঠে আবার ডাকিল, "পঙ্ক, বোন আমার;—অবুঝ হ'স্‌নে বোন। তুই আমার চোখের সামনে যে বৈকুণ্ঠের আলো এনে ধরিছিস্, তা ফুরিয়ে যাবার আগেই আমার যেন সব শেষ হয়ে যায়। তুই আমার আজ এমন বোন সেই গর্ব্বে আমার সমস্ত প্রাণ ফেটে ভেঙ্গে যাবার মত হ'য়েছে। এ সময় তুই বোন অবুঝ হস্‌নে। আমার মা বাপের ভার তোর হাতে দিয়ে চল্লুম, দেখিস্ বোন তাদের দেখিস্। তুই শান্তিময়ী হয়ে তাদের বুকের ব্যথা ধুয়ে মুছে দিস। আমার মাকে মা ব'লে ডেকে আমার অভাব ভুলিয়ে রাখিস্।"

নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল, সে একেবারে নির্জ্জীব

পঙ্কজিনীর শেষ নিশ্বাস বড় জোরে একবার বাহির হইয়া আসিল। সে দেবেনবাবুর বক্ষের উপর ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিল। ঠিক সেই সময় দরজা ঠেলিয়া নরেন্দ্রনাথের শ্বশুর মহাশয় লালিত্যময়ীকে সঙ্গে লইয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। দরজা খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে গোধূলীর একরাশ অন্ধকার গৃহেব ভিতর প্রবেশ করিয়া হা হা করিয়া যেন একটা বিকট বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া উঠিল।

সম্পূর্ণ

লক্ষ্মীবিলাস পাবলিসিং হাউস হইতে
প্রকাশিত—

কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

অপরাধিনী

সচিত্র সুন্দর সামাজিক উপন্যাস রেশমে বাঁধা মূল্য—১৷৷০

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত

অভিমান

সচিত্র সুন্দর সামাজিক উপন্যাস রেশমে বাঁধা মূল্য—১৷৷০

মনির বর

সচিত্র সুন্দর সামাজিক উপন্যাস রেশমে বাঁধা মূল্য—১৷৷০

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত

কালের কোলে

অতি অপূর্ব্ব সুন্দর পারিবারিক উপন্যাস মূল্য—১৲